সপ্তদশ দার্‌স

الدرس السابع عشر

তাঁর সহিষ্ণুতাঃ

صبره ﷺ

তাঁর সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আলোচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন এবং তাঁর জীবনীর সমূহ ঘটনাবলীর বিস্তারিত অলোচনা করা। কারণ, তাঁর পুরো জীবনটাই হলো সহিষ্ণুতা-ধৈর্যশীলতা, জিহাদ ও শ্রম-সাধনায় পরিপূর্ণ। যেদিন প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়, সেদিন থেকে নিয়ে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে বিরতিহীন আমল জারী রেখেছিলেন। যেদিন তিনি নবীরূপে নির্বাচিত হোন, প্রথম যেদিন তাঁর সাথে ফেরেশ্‌তার সাক্ষাৎ হয়, যেদিন খাদীজা তাঁকে ওরাক্বা ইবনে নাওফালের কাছে নিয়ে যান, ওরাক্বা ইবনে নাওফাল তাঁকে যখন বললেন, আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দিবে, তিনি-ﷺ-তখন ওরাক্বা ইবনে নাওফালকে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দিবে?" অরক্বা বললেন, হ্যাঁ, যা নিয়ে তুমি এসেছো, তদ্রূপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে, সেই দিন থেকে তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যে, এই পথে তাঁকে কোন্ কোন্ জিনিসের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে তিনি শুরু থেকেই কষ্ট-কাঠিন্য এবং প্রতারণা ও শত্রুতা সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন।

অনুরূপ তাঁর ধৈর্যের বাস্তব চিত্র তখনও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিলো, যখন তিনি মক্কায় তাঁর প্রতিপালকের পায়গাম পৌঁছাতে গিয়ে স্বীয় জাতি, পরিবারবর্গ এবং নিজের বংশের লোকদের নিকট থেকে দৈহিক পীড়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন, বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আম্‌র ইবনে আ'সকে অতীব কঠিন সে আচরণটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা মুশরিকরা নবী করীম-ﷺ-এর সাথে করেছিলো। তিনি বললেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় উক্ববা ইবনে আবূ মুআইত্ব তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের চাদর তাঁর গলায় জড়িয়ে খুব জোরে টান দেয়। তখন আবূ বাকার-رضي الله عنه-তার (উক্ববার) কাঁধদু'টি ধরে তাকে নবী করীম-ﷺথেকে ঠেলে সরিয়ে দেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ?"

অনুরূপ কোন একদিন তিনি-ﷺ-কা'বার নিকট নামায পড়ছিলেন এবং আবূ জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী সেখানে বসেছিলো। এমন সময় তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন যে উমুক গোত্রের উঁটের বাচ্চাদানি এনে মুহাম্মাদ যখন সাজদায় যাবে তার পিঠের উপর রেখে দিতে? অতঃপর তাদের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি উঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদায় গেলেন, তখন সেই পাষন্ডটি সেটি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যখানে পিঠের উপর রেখে দিলো। তারা হাসাহাসি করতে এবং (হেসে) একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাজদায় ছিলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় তাঁর মেয়ে ফাতিমা এসে তা তাঁর পিঠ থেকে তা সরিয়ে দিলেন।' এর থেকেও কঠিন হলো তাঁর মানসিক কষ্ট, যা তিনি পেতেন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে, তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে এবং এই অপবাদ দিলে যে, তিনি জ্যোতিষী, কবি, পাগল, যাদুকর এবং যেসব নিদর্শনাবলী তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সবই হলো, পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী। এরই পর্যায়ভুক্ত হলো আবূ জেহেলের বিদ্রূপমূলক এই উক্তি, 'হে আল্লাহ! যদি এই (মুহাম্মাদ) তোমার পক্ষ থেকে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা আমাদের উপরে কঠিন আযাব নাযিল করো। তাঁর চাচা আবূ লাহাব তো সব সময় তাঁর পিছনে লেগে থাকতো যখন তিনি লোকদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের সমাবেশে এবং বাজারে যেতেন। সে (আবূ লাহাব) তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতো এবং লোকদেরকে নিষেধ করতো তাঁর সত্যায়ন করতে। এদিকে

তার স্ত্রী উম্মে জামীল কাঁটা বিশিষ্ট ডাল কেটে এনে তাঁর পথে ফেলে রাখতো। নির্যাতন-নিপীড়ন তার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে যখন তাঁকে তাঁর সাথীদের সহ তিন বছর পর্যন্ত আবূ তালিবের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতাও খেতে হয়েছিলো। দুঃখ তখন আরো বৃদ্ধি পায়, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান। যিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন ও তাঁর সাহায্য করতেন। অতঃপর তাঁর চাচাও হঠাৎ করে মারা যান যিনি তাঁর হেফাযত করতেন এবং তাঁর হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন। আবার তার (চাচার) কুফ্‌রী অবস্থায় মারা যাওয়ায় দুঃখের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। শেষ পর্যায়ে একদিন তাঁকে হত্যা করার কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানোর পর তাঁর মাতৃভূমি থেকে তিনি হিজরত করে চলে যান। মদীনায় ধৈর্য ও ত্যাগের নতুন জীবন শুরু হয়। সে জীবন শুধু কষ্ট ও পরিশ্রমের, ক্ষুধা ও অভাবের। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাখার জীবন। তিনি-ﷺ-বলেন, **"আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কাজে আমাকে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে করা হয় নি। আমাকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে দেওয়া হয় নি। ত্রিশ দিন ও রাত আমার উপর এমনও অতিবাহি হয়ে গেছে যে, আমার ও বিলালের কাছে কোন প্রাণীর খাবার মত কিছুই ছিলো না, কেবল সেই স্বল্প পরিমাণটুকু ছাড়া, যা বিলাল তাঁর বগলের তলে লুকিয়ে এনেছিলেন।"** তাঁর সম্ভ্রমে অপবাদ দেওয়া হয়। মুনাফেক্ব ও মূর্খ বেদুঈন লোকদের পক্ষ থেকেও তাঁকে কষ্ট পেতে হয়। বরং বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-رضي الله عنه-বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (যুদ্ধলব্ধ মাল) বন্টন করলেন। আনসারদের হতে একজন বললো, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা নেই। ইবনে মাসউদ-رضي الله عنه-বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে এসে এ খবর তাঁকে জানালাম। (শুনে) তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তিনি বলেন,"আল্লাহ মুসার প্রতি রহম করুন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো, তবুও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন।" আর তাঁর ধৈর্য ধরার মুহূর্তগুলোর মধ্যে হলো সেই দিনগুলো, যেদিনে তাঁর ছেলে-মেয়েরা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সন্তান ছিলো সাতজন। একের পর এক তাঁরা সব মারা যান। ফাতিমা ব্যতীত তাঁদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। তবুও তিনি দমেও যান নি ভেঙ্গেও পড়েন নি, বরং সুন্দর ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। এমন কি ছেলে ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিনে তাঁর মুখ থেকে এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, **"চক্ষু অশ্রু ঝরায়, অন্তর ব্যথিত হয় এবং আমরা তা-ই বলবো, যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হোন। আর হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে মর্মাহত।"**

আর নবী করীম ﷺ-এর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য কেবল নির্যাতন-নিপীড়ন এবং বিপদাপদের মধ্যেই সীমিত ছিলো না, বরং পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বড়ই ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রতিপালক তাঁকে এর নির্দেশও দিয়েছেন। তাই তিনি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে এমনভাবে পরিশ্রম করতেন যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা দু'টি ফুলে যেতো। রোযা ও যিক্‌র সহ অন্যান্য ইবাদতসমূহ খুব বেশী বেশী করতেন। (এত বেশী কেন করেন) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"